বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের দুই বছর

একটি পর্যালোচনা

তথ্য অধিকার টিম, রিইব

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের দুই বছর: একটি পর্যালোচনা

তথ্য অধিকার টিম, রিইব

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের দুই বছর: একটি পর্যালোচনা

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১১

প্রকাশক
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব)
বাড়ি-১০৪, সড়ক - ২৫, ব্লক - এ, বনানী, ঢাকা - ১২১৩
ফোন : ৮৮০-২-৮৮৬০৮৩০-১
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮১১৯৬২
ই-মেইল : rib@citech-bd.com,
Website : www.rib-bangladesh.org

মুদ্রণে
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড
গ-১৬ মহাখালী বা/এ, ঢাকা - ১২১২
ফোন: ৮৮২৮৭০৩, ৮৮৩৫৮৩৬

মূল্য : ৪০.০০ টাকা

মুখবন্ধ

২০০৯ সালের ১লা জুলাই থেকে সারাদেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ চালু হবার পর পরই রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) অনুধাবন করে যে এটি একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় আইন যার ব্যবহার ও প্রয়োগ সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। রিইব তাই ঠিক করে যে তাদের মধ্যে এই আইনটি সম্বন্ধে অতি দ্রুত সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তার জন্যে এইসব গোষ্ঠীর ভেতর থেকেই কয়েকজন এনিমেটর বা উদ্দীপক নির্বাচন করে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ শুরু করে দেয়। এনিমেটরদের এমনভাবে তৈরী করা হয় যে, তারা যেন তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের লক্ষ্যে এসব জনগোষ্ঠীকে তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বা চাহিদাগুলো চিহ্নিত করতে সহায়তা করতে পারে। কোন্ কোন্ বিষয়ে তথ্য চাইতে হবে তা ঠিক করার পর সেইসব তথ্যের জন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে, কীভাবে আবেদনপত্র তৈরী করতে হবে এবং কীভাবে আবেদনপত্র কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে, এনিমেটররা সেইসব বিষয়ে জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সহায়তা করে।

মাঠ পর্যায়ে হাতে-নাতে এসব কাজের মধ্য দিয়ে আমরা অনেক শিখেছি ও জেনেছি। জনগণকে তথ্য সরবরাহ করার জন্য দেশে যে একটি নতুন আইন প্রণয়ন হয়েছে এবং এই আইন অনুযায়ী সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহকে জনগণের প্রার্থীত তথ্য প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে এবং গোপনীয়তায় আবদ্ধ ও রুদ্ধদ্বার সরকারী অফিস-সংস্কৃতির দিন শেষ হয়ে গিয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জন-বান্ধব সরকারী কর্মকান্ড পরিচালনার যে এক বিরাট সুযোগ ও সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে এই বিষয়গুলো সরকারী কর্মকর্তাদের বোঝানো যে কতো কঠিন কাজ তা আমরা ভালভাবেই উপলব্ধি করছি।

সরকারী অফিসে তথ্য চাইতে গিয়ে শুরুতে এসব জনগোষ্ঠীর সদস্যদের অনেক অপমান-অপদস্ত-হেনস্থা হতে হয়েছে। তবে আনন্দের বিষয় হচ্ছে ধীরে হলেও এখন বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনের সূত্রপাত হচ্ছে। আবেদনের প্রেক্ষিতে এসব অফিসের অনেক কর্মকর্তা এখন শুধু প্রার্থীত তথ্যই প্রদান করছেন না, সেই সঙ্গে সরকারের 'সেফটি-নেট' ও এই জাতীয় অন্যান্য কর্মসূচীর আওতায়

তাদের প্রাপ্য অধিকারসমূহও নিশ্চিত করছেন। এসবের ফলে জনগণের মাঝে অভূতপূর্ব আস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। একই সঙ্গে সরকারী অফিসের কর্মকর্তারাও তাদের সাথে এখন অনেক ভাল ব্যবহার করছেন। এসব অভিজ্ঞতা আমাদের আরো ব্যাপকতর পরিমন্ডলে কাজ করতে উৎসাহিত করছে। আইনটি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা তার মধ্যে একটি। আর একটি হলো, তথ্য অধিকার আইনের মতো একটি যুগান্তকারী আইনের সফল বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা। রিইব-এর উদ্যোগে যেসব জনগোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেছিল কমিশনের পক্ষ থেকে প্রথমেই সেগুলোর শুনানি শুরু করায় আমরা তথ্য কমিশনের কাছে কৃতজ্ঞ। তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে যেসব অভিযোগ নিষ্পত্তির উল্লেখ আছে তার বেশীর ভাগই এসেছে রিইব-এর সহায়তায় যেসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথ্যের জন্যে আবেদন করেছিল তাদের কাছ থেকে।

রিইব-এর তথ্য অধিকার টিম সংযুক্ত এই লেখাটি তাদের দুই বছরের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন উৎস থেকে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরী করেছে। তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ ও সমস্যাগুলোও লেখাটিতে উঠে এসেছে। সেই সঙ্গে কিছু সম্ভাবনার দিকও চিহ্নিত হয়েছে। এসবের ভিত্তিতে নিবন্ধের শেষে কতোগুলো গঠনমূলক সুপারিশও পেশ করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, তথ্য কমিশনসহ সুপারিশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য সবাই সেগুলো বাস্তবায়নের কথা বিবেচনা করবেন।

শামসুল বারি,
চেয়ারম্যান, রিইব
১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের দুই বছর: একটি পর্যালোচনা

১. পটভূমি :

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের আরো ৯০টি দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যারা তাদের নাগরিকদের সরকারী কাজ-সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য জানার অধিকার প্রদান করেছে। তবে বাংলাদেশে এই আইনের আওতায় শুধু সরকারই নয়, বিদেশী/সরকারী অর্থপুষ্ট এনজিও-দেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (এরপর থেকে এই লেখায় সরকারী ও এনজিও কর্তৃপক্ষগুলোকে এক কথায় **পাবলিক কর্তৃপক্ষ** বলে অভিহিত করা হবে)।

তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে দেশের সব নাগরিক জনগণের অর্থে পরিচালিত পাবলিক কর্তৃপক্ষসমূহের কাছ থেকে জনগুরুত্বপূর্ণ ও অপ্রকাশিত যাবতীয় তথ্য জানার অধিকার অর্জন করে। আইনের উদ্দেশ্য, এই সব তথ্য জেনে জনগণ যেমন কর্তৃপক্ষসমূহের কাছে তাদের ন্যায্য অধিকারগুলো আদায় নিশ্চিত করতে পারবে তেমনি তার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষগুলোর কাজে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। তাই একটি সফল তথ্য অধিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন নাগরিক যেমন ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হতে পারে তেমনি একটি বৃহত্তর সমাজও লাভবান হয়। এই কারণেই, অনেকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-কে বাংলাদেশে এ যাবতকালীন প্রণীত সব আইনের মধ্যে সবচেয়ে যুগান্ত কারী আইন হিসেবে গণ্য করেন।

২. এই লেখার মূল উদ্দেশ্য :

এই লেখায় বাংলাদেশে গত দুই বছরে তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা মূল্যায়ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, এ ধরণের একটি যুগান্তকারী আইনের কার্যকারিতা স্থাপন ও তার মূল্যায়ণের জন্য দু'বছর সময় যথেষ্ট নয়। কারণ এই আইনটির প্রয়োগের মাধ্যমে পাবলিক কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানসিকতা পরিবর্তনের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা অত্যন্ত দূরূহ কাজ ও নিঃসন্দেহে সময় সাপেক্ষ। তবে শুরুটা আশানুরূপ হচ্ছে কিনা তা জানার জন্যে দুবছর সময় খুব কম নয়। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশে গত দুই বছরে তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে এই আইনটির প্রধান দিকগুলোর অগ্রগতি নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. তথ্য অধিকার আইনের মূল তিনটি দিক :

তথ্য অধিকার আইনের তিনটি মূল দিক হচ্ছে: চাহিদার দিক (ডিমান্ড সাইড) যার মাধ্যমে জনগণ এই আইনটিকে ভিত্তি ক'রে পাবলিক কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য চাইতে পারে ; তথ্য যোগানের দিক (সাপ্লাই সাইড) যার মাধ্যমে পাবলিক কর্তৃপক্ষসমূহ জনগণকে তাদের প্রার্থীত তথ্য প্রদান করে এবং বিরোধ মিমাংসার দিক (ডিসপিউট রেজুলেশন সাইড) যার মাধ্যমে এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন ওপরের দুই পক্ষের বিরোধ মিমাংসা করে। এই তিনটি দিকের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতির ভিত্তিতে তথ্য অধিকার আইনের সার্বিক অর্জন বিচার করা যায়। এই লেখাতে প্রধানতঃ তা-ই করা হবে।

৪. তথ্য অধিকার আইনের তিনটি দিকের অগ্রগতির পর্যালোচনা :

নিচের আলোচনাতে তিনটি দিকের কার্যক্রমকে নিরিক্ষার দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা করতে গিয়ে তিনটি দিকের সামনে যেসব সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ দেখা দিচ্ছে তা আলোচনা করা হবে এবং একই সাথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিসমূহও চিহ্নিত করা হবে। পরিশেষে, সবকিছুর বিচারে কিছু সুপারিশ দাঁড় করানো হবে।

ক) তথ্য-চাহিদার দিকের পর্যালোচনা :

ক-১: বাংলাদেশের মতো একটি দেশে যেখানে যুগ যুগ ধ'রে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দাপ্তরিক গোপনীয়তার সংস্কৃতিতে গভীরভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন তা পরিবর্তন করে একটি উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ তথ্য সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে জনগণকে অবাধ তথ্য প্রদানে তাদের বাধ্য করা যাবে এ কথা প্রায় কেউই বিশ্বাস করেন না। ফলে জনগণকে দিয়ে তথ্যের জন্য আবেদন করার সংস্কৃতি তৈরী করার কাজটি নিঃসন্দেহে খুব কঠিন। তাই তথ্য চাহিদার দিকের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে জনগণ এখনও আইনটির ব্যাপারে তেমনভাবে উৎসাহী নন; আইনটিকে বিশদভাবে জানতে চান না এবং জানলেও এর মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাদের ধারণা পরিষ্কার নয়। এর ফলে গত দু'বছরে এই আইনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য চেয়ে জনগণ কর্তৃপক্ষের কাছে খুব নগন্য সংখ্যক আবেদন করেছেন।

ক-২: অবশ্য সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্য কমিশনের প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সারাদেশে ২০১০ সালের শেষ দিন পর্যন্ত জনগণ বিভিন্ন সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে প্রায় ২৩,০০০ আবেদন করেছে। কিন্তু প্রতিবেদনে

প্রকাশিত অন্যান্য তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, কার্যতঃ প্রকৃত তথ্য আবেদনের সংখ্যা অনেক কম। কারণ, এসব আবেদনের বেশিরভাগই আইনটির মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অর্থাৎ যেসব তথ্যের মাধ্যমে জনগণ জানতে পারে পাবলিক কর্তৃপক্ষসমূহ আইনানুগ ও ন্যায়নিষ্ঠভাবে তাদের কাজ পরিচালনা করছে বা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কিনা সেসব তথ্য প্রায় কোনো আবেদনেই চাওয়া হয়নি।

ক-৩: তাই এই আইন প্রয়োগের ব্যাপারে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জনগণকে সঠিকভাবে বোঝানো যে, আইনটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারী কাজ-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য আবেদন ক'রে সরকারী কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত করা। তাই আইনটি ব্যবহারের মাধ্যমে শুধু সেইসব তথ্যই চাওয়া দরকার যা পাবলিক কর্তৃপক্ষসমূহ সাধারণতঃ জনগণকে জানতে দিতে চায় না। তার কারণ তাতে তাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন হচ্ছে কিনা এবং তাদের কাজে কোনো অস্বচ্ছতা আছে কিনা তা ধরা পড়ে যেতে পারে। তাই এই আইনের মাধ্যমে অন্য যেসব তথ্য এই আইনের প্রয়োগ ছাড়াই পাওয়া যায় এবং যা কোন গোপনীয় তথ্য নয় সেরকম তথ্য চেয়ে এই আইনের মূল উদ্দেশ্যকেই খর্ব করা হয়। এর ফলে সরকারী কর্মচারীদের উপর কাজের চাপ বাড়ে কিন্তু তাতে সরকারী কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় কোন সহায়তা হয়না। তাই জেনে ও বুঝে সঠিক তথ্যের জন্য আবেদন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই আইনের মাধ্যমে কিভাবে ভিজিএফ কার্ড পাওয়া যায় জানতে চাওয়ার চেয়ে একটি এলাকায় কারা কার্ড বরাদ্দের লিস্ট তৈরী করেছেন সেই তথ্য জানতে চাওয়া আরো জরুরী। তাহলে জানা যাবে নাম বাছাইয়ের কাজে স্বজনপ্রীতি বা দুর্নীতি কাজ করেছে কিনা। সচারচর জনগণ যে ধরণের তথ্যের জন্যে আবেদন করে, যেমন বন্দুকের লাইসেন্স কিভাবে পাওয়া যায়, তার জন্য তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের প্রয়োজন হয়না। এগুলো নির্দিষ্ট সরকারী দপ্তর থেকে খোঁজ-খবর করে জোগাড় করা যায়।

ক-৪: উপরের ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, তথ্য কমিশনের বাৎসরিক প্রতিবেদনে উল্লিখিত আবেদনের ৯৯.৭% কেন কর্তৃপক্ষসমূহের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। আরো বোঝা যায়, এ ব্যাপারে আবেদনকারীদের কেন কোন আপীল করতে হয়নি কিংবা তথ্য কমিশনে অভিযোগও করতে হয়নি। আর সেই একই কারণে সরকারী কোষাগারে কীভাবে প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা জমা পড়েছে তাও বোঝা যায়। উল্লিখিত প্রায় সব আবেদনেই যে এমন সব তথ্য চাওয়া হয়েছে যার সঙ্গে স্বচ্ছতার কোন সম্পর্ক নেই, যার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে কোন গোপন তথ্য উন্মোচন করতে হয়নি, অর্থাৎ যা সরবরাহ করতে

কর্তৃপক্ষের কোন মাথা ব্যাথা হয়নি এবং যা প্রদান করতে শুধু সরকারের কাছে রক্ষিত যাবতীয় ডকুমেন্টের ফটোকপি করে সরবরাহ করতে হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। সরকারের ১৪ লক্ষ টাকা রোজগারের হিসাব থেকে বোঝা যায় যে, প্রায় ৭ লক্ষ পৃষ্ঠার ফটোকপি প্রদান করা হয়েছে। কারণ, আইনটির বিধি অনুযায়ী আবেদনকারীকে প্রতি পৃষ্ঠার জন্য ২ টাকা জমা দিতে হয়। তাই এতগুলো আবেদনের ফলে তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে খুব একটা অগ্রসর হওয়া গেছে তা বলা যাবে না।

ক-৫: তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই আইনটির সঠিক প্রয়োগের ব্যাপারে জনগণকে বোঝাতে ও আশ্বস্ত করতে হবে যে, সরকার সত্যিই এই আইনটির সফল প্রয়োগ দেখতে চায়। দেশের বেশিরভাগ লোকই এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যে সরকার সত্যি সত্যিই যাবতীয় সরকারী তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত করে দিতে প্রস্তুত। যুগ যুগ ধ'রে সরকারী কাজের গোপনীয়তা এবং সরকারী তথ্য জনগণকে জানতে না দেয়ার যে সংস্কৃতি চলে আসছে তাতে জনগণের এই অবিশ্বাস অমূলক নয়। তবে চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে কীভাবে জনগণের মনে এই বিশ্বাস স্থাপন করা যায়।

ক-৬: আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে, অন্যান্য অনেক দেশে মিডিয়া/গণমাধ্যমগুলো তথ্য অধিকার আইন প্রসারে যে ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশে এখনও তা হচ্ছে না। মিডিয়া/গণমাধ্যম মনে করছে যে, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার ক'রে তথ্য আদায় প্রক্রিয়া খুবই সময়-সাপেক্ষ ও ঝামেলাপূর্ণ। তাই তাদের জন্য চিরাচরিত প্রথায় নানাবিধ প্রভাব খাটিয়ে সরকারের বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য আদায় করার প্রক্রিয়াই অনেক সহজ মনে হয়। সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে জানা গেছে যে, কিছু সাংবাদিক এই আইনটি ব্যবহার করে অনুসন্ধানি (ইনভেস্টিগেটিভ) প্রতিবেদন তৈরী করতে গিয়ে বিফল হয়েছেন। কারণ, যেসব কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁরা তথ্যের জন্য আবেদন করেছিলেন তাঁরা এই আইনটি সম্বন্ধে কিছু জানেন না বলে জানান ও আবেদনকৃত তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

ক-৭: তথ্যের জন্য চাহিদা তৈরির ক্ষেত্রে আরেকটি বড় অসুবিধা হচ্ছে আমাদের দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (এনজিও) বেশিরভাগই আইনটি থেকে দূরে থাকছে। এর প্রধান কারণ, এদের মধ্যে যারা সরকারী/বিদেশী অর্থায়নে কাজ করে তারা সবাই আইনটির আওতাভুক্ত। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয়, তারা ভয় পায় এই ভেবে যে, সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আইনটি প্রয়োগ করে গোপন ও সংবেদনশীল (সেনসিটিভ) কোন তথ্য চাইতে গেলে তারা তাদের

উপর ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে। তবে এখানে বলে রাখা ভাল যে, এসব কারণ সত্ত্বেও বেশ কিছু এনজিও আইনটির প্রসারের কাজে এগিয়ে এসেছে।

ক-৮: নাগরিক সমাজের (সিভিল সোসাইটি) ভূমিকাও এনজিও-দের চেয়ে খুব আলাদা নয়। এদের অনেকেই ভয় পান যে, কোন কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের পক্ষে অস্বস্তিকর কোন তথ্য চাইলে তারা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে, তাই তাদের না ঘাটানোই ভালো। এই কারণেই হয়তো এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে অন্যদেশের মত তেমনভাবে তথ্যকর্মী (ইনফরমেশন এ্যাকটিভিস্ট) তৈরী হচ্ছে না।

ক-৯. রাজনৈতিক দল ও কর্মীরাও আইনটি সম্পর্কে তেমন জানেন না এবং জানতে আগ্রহীও নন। তাদের কীভাবে এই অপরিসীম সম্ভাবনাময় আইন সম্পর্কে উৎসাহী করা যায় তা নিয়ে সবাইকে ভাবতে হবে। একই কথা আইনবিদ ও আইনজীবিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

খ) তথ্য যোগানের দিক সম্বন্ধে পর্যালোচনা :

খ-১: জনগণের অবিশ্বাসের পাশাপাশি সরকারী কর্মকর্তাদেরও আইনটি সম্বন্ধে অনীহা ও এটিকে কার্যকর করার জন্যে সরকারী অফিসে বহু যুগ ধরে সৃষ্ট গোপনীয়তার সংস্কৃতি পরিবর্তন করে স্বচ্ছতার সংস্কৃতি তৈরীর ব্যাপারে তাদের অনাগ্রহও পরিস্থিতি বদলানোর জন্যে সহায়ক নয়। তাদের বেশীর ভাগই আইনটি সম্বন্ধে জানেন না, জানতে চান না বা জানলেও তাকে কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের তেমন আগ্রহ নেই। এ আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট সরকারী অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসমূহ (সংক্ষেপে দাপ্রাক), যাদের কাছে দেশের নাগরিকবৃন্দ তথ্যের জন্য আবেদন করবেন, তাঁরাও আইনটি সম্পর্কে ভালভাবে জানেন না। সারা দেশে যারা তথ্যের জন্য আবেদন করেছেন তাঁদের অনেকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়েছে। তাছাড়া তথ্য কমিশনের শুনানীতে অনেক দাপ্রাক এ কথাই বলেছেন।

খ-২: এই সঙ্গে জড়িত আরেকটি সমস্যা হচ্ছে যে, সরকারী দপ্তরগুলো এখনও দাপ্রাক নিয়োগের ব্যাপারটিকে সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না। যাদের এ দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে, তাদের খুব একটা বিচার-বিবেচনা করে এ দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে বলে মনে হয়না। তাছাড়া নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা দপ্তরের আরও অনেক কাজে নিয়োজিত থাকেন বলে এ কাজে তেমন একটা সময় দিতে পারেন না। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবের পাশাপাশি তাঁদের প্রয়োজনীয় চাহিদা (যেমন ফটোকপি

মেশিন) অনেক ক্ষেত্রেই পূরণ করা হয়না। আর এটাও দেখা গেছে যে, এঁদের অনেকেই কাজ শুরু করতে না করতেই বদলি হয়ে যান। নতুন ব্যক্তিকে আবার নতুন করে কাজ শিখতে হয়। এই পরিস্থিতি আইনটির প্রসারে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

খ-৩: আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে, সরকারী অফিসগুলোতে তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা সেই চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী চলে, আধুনিক তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। তাই দাপ্রাকদের অনেককেই তথ্য যোগাড় করে সময়মত যোগান দিতে বেগ পেতে হয়।

খ-৪ তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সরকারী অফিসগুলোতে এখনও সেই চিরাচরিত সরকারী গোপনীয়তা আইনের প্রভাব রয়ে গেছে। যতদিন পর্যন্ত না এই সংস্কৃতির বদলে জনগণের প্রতি জবাবদিহিতাপূর্ণ ও খোলামেলা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন পর্যন্ত এ সমস্যা থেকেই যাবে। কাজটি যে সহজ নয় তা বলাই বাহুল্য ।

গ) তথ্য কমিশনের কাজের পর্যালোচনা :

গ-১: প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে স্বাভাবিক কারণেই তথ্য কমিশনকে অফিস কাঠামো, প্রশাসনিক, দাপ্তরিক, অফিস সরঞ্জামাদি যোগাড়, কম্পিউটার ও অন্যান্য মেশিনপত্র, আসবাবপত্র যোগাড়, ওয়েবসাইট তৈরি, বিধিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। কমিশনকে সরকারী অফিস সমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তা নিয়োগের জন্যে লেখালেখি করতে হয়েছে। একইভাবে আরো জোড়ালোভাবে এনজিও-দের কাছেও চিঠি দিতে হয়েছে। এসব কাজ একটি কার্যকর তথ্য কমিশন গঠনে খুবই জরুরী। তাই এসব বেশিরভাগ কাজই সফলভাবে সমাপ্ত করার জন্য তথ্য কমিশন অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। তবে এ ব্যাপারে অনেক অসম্পূর্ণ কাজ রয়ে গেছে, যেমন কমিশনের ওয়েবসাইটকে নিয়মিত আপডেট করা ও আরো জনবান্ধব করে তোলা, নতুন বিধিমালা সংযোজন করা ইত্যাদি ।।

গ-২: এখন তাদের অন্যান্য কাজে মনোযোগ দিতে হচ্ছে, যেমন অভিযোগ সমাধানে শুনানীর ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রেও তাদের বহু কিছু করণীয় আছে যার মাধ্যমে এই অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ব্যবস্থাটিকে একটি শক্তিশালী ইঞ্জিনে পরিণত করে তথ্য অধিকার আইনকে আরো ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত খুব কম লোকই কমিশনের শুনানীর কথা জানে। তাছাড়া এতদিন পর্যন্ত যে ক'টি শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সংখ্যা অতি নগণ্য, সব মিলে ৪০টিও হবে না।

এটা একটা চিন্তার ব্যাপার। কেন এত কম অভিযোগ আসছে তা কমিশনকে ভেবে দেখতে হবে। কিংবা হয়তো এ ব্যাপারে কমিশন খুব ধীর গতিতে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । তবে কেন তা সকলকে জানানো দরকার।

গ-৩: কমিশন কেন অভিযোগ শুনানীর ব্যাপারটি নিয়ে তেমন প্রচার করছে না তাও বোধগম্য নয়। হয়তো এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞতার কারণে সিদ্ধান্ত প্রদানের ব্যাপারে একটু সতর্কভাবে অগ্রসর হতে চাইছে। জানা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে ছয়মাস পার হয়ে যাবার পরও কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেনি । এটা সত্যি হলে একটু চিন্তার বিষয় হবে এবং তা আইনের পরিপন্থীও হবে। শুনানীর সিদ্ধান্ত সময়মত প্রকাশ ও প্রচার করা আইনটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অত্যন্ত জরুরী। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে কমিশন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শুনানীর ব্যবস্থা করছে না বলে অভিযোগ আসছে। কমিশন নিজেই আইন অমান্য করলে অন্যকে বলার মুখ থাকবে না। এ ব্যাপারে কমিশনকে সঠিক পরিস্থিতি সবাইকে জানাতে হবে।

গ-৪: তবে এসব কিছুকে ছাপিয়ে কমিশনের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে একটি সঠিক কৌশল ঠিক করে আইনটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে কমিশনের মূল লক্ষ্য হবে পাবলিক কর্তৃপক্ষের সব কর্মচারীদের মানসিকতা পরিবর্তন করে তাদের মনে স্বচ্ছতার আদর্শ স্থাপন করা। সে কাজ তেমনভাবে এখনও শুরু হয়নি বলে মনে হয়।

গ-৫: আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তথ্য কমিশনের সকল কাজে নীতি ও বিধিসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা অনুসরণ করা। এসবেরই মূল উদ্দেশ্য হবে যে, তথ্য কমিশন তার কাজের মাধ্যমে জনগণের কাছে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত হবে, সরকারী কোন প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়। কমিশনের এ কাজটি সহজ নয়। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই কমিশনকে নানাভাবে সরকারের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। আরেকটি বাঁধা হচ্ছে, তথ্য কমিশনের উচ্চপদস্থ বেশিরভাগ কর্মকর্তাগণ সরকারের কাছ থেকে প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং একজন ছাড়া অন্য দুজন তথ্য কমিশনারও সাবেক সরকারী কর্মকর্তা।

গ-৬: তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রধান অভিভাবক হিসেবে তথ্য কমিশনের পক্ষে নাগরিকবান্ধব হওয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই। কারণ আইনটি তৈরীই হয়েছে জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য। তাই তথ্য কমিশনকে সব সময়ই খেয়াল রাখতে হবে কীভাবে জনগণ তাদের এ আইনী অধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারে । বিশেষ করে তথ্য কমিশনকে সরকারী কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা স্থাপনের মূল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে হবে।

কমিশনের একটি প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সকল পাবলিক কর্তৃপক্ষকে তাদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সবসময় সতর্ক রাখা । কমিশন এখনো সেই কাজে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করতে পেরেছে বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়না ।

ঘ) সম্ভাবনার কয়েকটি দিক :

ঘ-১: গত দু'বছরে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগে সমস্যার পাশাপাশি কিছু সম্ভাবনার দিগন্তও উন্মোচিত হয়েছে । সবচেয়ে বেশি আশার দিক হচ্ছে কিছু কিছু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা । তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের কিছু কিছু সমস্যা সমাধানে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে ইতিমধ্যেই ভালো ফল পেতে শুরু করেছে । বর্তমানে তারা তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা (সেফটিনেট) প্রকল্পসমূহের সুবিধাসহ অন্যান্য কিছু সুবিধা পেতে সক্ষম হচ্ছে । আগে দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে তারা এগুলো থেকে বঞ্চিত হ'ত । তবে তাদের ধীরে ধীরে বোঝাতে হবে যে, তথ্য অধিকার আইন শুধু ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করলে চলবে না, এর মাধ্যমে পাবলিক কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা স্থাপনের লক্ষ্যও মনে রাখতে হবে । একই প্রক্রিয়ায় যে এ দু'টি কাজই করা সম্ভব তা তাদের বোঝাতে সাহায্য করবে তথ্যকর্মীরা ।

ঘ-২: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের আরেকটি ভাল দিক হচ্ছে তারা এই আইনটি ব্যবহারের মাধ্যমে পাবলিক কর্তৃপক্ষসমূহের কাছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নানাবিধ তথ্যের জন্য আবেদন ক'রে নিজেদের জীবনে যেমন সুবিধা আদায় করতে পারে তেমনি সরকারী কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা স্থাপনে ভূমিকা রাখতে পারে । এসব ব্যাপারে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকজনের আগ্রহ কম । কারণ তারা অন্য উপায়ে তাদের কাজ আদায় করে নিতে পারে । এসব বিষয়ে স্বাভাবিক কারণেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উৎসাহ বেশি, তাই তাদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে উৎসাহিত করা অনেক সহজ হয় । তথ্য চাহিদার বিষয়টিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য এ বিষয়টিকে ভবিষ্যতে আরো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে । এ ব্যাপারে এনজিওসমূহ এবং তথ্য অধিকার কর্মীদের ভূমিকা খুবই জরুরী ।

ঘ-৩: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর সাফল্যের পেছেনে উজ্জীবকদের (এনিমেটর) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা গেছে । উজ্জীবকরা এসব জনগোষ্ঠীকে তথ্য আবেদনের বিষয় নির্ধারণ করতে ও খসড়া আবেদনপত্র লিখতেও সাহায্য করে থাকে । উজ্জীবকরা নিজেরা আইনটি ভালভাবে জেনে জনগণকে আইনের

গুরত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে পারে। তারা ঐ জনগোষ্ঠীর লোকজনদের কাছে সহজেই বিশ্বস্ততা অর্জন করতে সক্ষম হয়, কারণ তারা বেশিরভাগই একই সম্প্রদায়ভুক্ত। তথ্য অধিকার আইনের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে জনগণকে তাদের সমস্যা নির্ণয় করতে, আবেদনপত্র লিখতে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তা জমা দিতে ও পুরো প্রক্রিয়াটির শেষ পর্যন্ত ফলোআপ করতে সাহায্য করা। এই কাজগুলো করার জন্য উজ্জীবক ও তথ্যকর্মী তৈরী করা আইনটি প্রসারের জন্য অপরিহার্য।

গ-৪: প্রথম দিকে যখন সরকারী কর্মকর্তাদের আইনটি সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না তখন আবেদনকারীরা মূল আইনের কপি ও তার সহজপাঠ তাদের হাতে তুলে দিয়ে এ আইন সম্বন্ধে তাদের জানতে সাহায্য করেছে। এটি বেশ ভাল ফল দিয়েছে। এই ধরনের চর্চা আইনটি সকলের জানা পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

ঘ-৫: আরো দেখা গেছে যে, যেসব কর্মকর্তারা প্রথমে তথ্য আবেদনকারীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন, পরবর্তীতে আইন জানার পর তাঁরা অনেকেই ভালো আচরণ করেছেন। তাঁরা জনগণের কাছ থেকে পরবর্তী পর্যায়ে যখন আরও বেশি তথ্য আবেদন পাওয়া শুরু করবেন তখন তাঁদের আচরণে আরো ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে ধারণা করা যায়।

ঘ-৬: অভিজ্ঞতার আলোকে মনে হয় যে, একটি আবেদনপত্রের মাধ্যমে পাবলিক কর্মকর্তারা তথ্য আইন সম্বন্ধে যা জানতে ও শিখতে পারেন তা অনেক সভা, সেমিনারের মাধ্যমে বক্তৃতা শুনে সম্ভব না। এভাবে চাহিদার দিককে শক্তিশালী করার মাধ্যমে যোগানের দিককেও শক্তিশালী করা সম্ভব।

তিনটি দিকের জন্য কতিপয় সুপারিশ :

১) সরকারের জন্য :

১.১ তথ্য অধিকার আইনের প্রসারে সরকারের সবচেয়ে বড় অবদান হবে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা যাতে তথ্য অধিকার আইনটি সঠিকভাবে জানে, বোঝে ও তা প্রয়োগ করতে আগ্রহী হয় তা নিশ্চিত করা। এর জন্য সরকার তথ্য কমিশনের সঙ্গে যৌথভাবে কৌশল নির্ধারণ করতে পারে। কৌশলের মূল লক্ষ্য হবে সরকারী দপ্তরসমূহে চিরাচরিত গোপনীয়তার সংস্কৃতির বদলে একটি জনবান্ধব খোলামেলা সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

১.২ সরকারকে অত্যন্ত জরুরীভাবে প্রজাতন্ত্রের সব কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মনের মধ্যে এ ধারণা স্থাপন করতে হবে যে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বলবৎ

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩", কার্যতঃ অকেজো হয়ে গেছে। তাই গোপনীয়তার মানসিকতা পরিবর্তন করাটা বর্তমানে একটি অত্যাবশকীয় কাজ। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও মন্ত্রী পরিষদের সদস্যগণের উচিত সকলকে বারবার মনে করিয়ে দেয়া যে, সরকার তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁদের নিরলসভাবে প্রচার করতে হবে যে, রুদ্ধদ্বার/গোপন/অস্বচ্ছ প্রশাসনের দিন শেষ হয়ে গেছে। লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকেও এই একই কথা বারবার বলতে/প্রচার করতে হবে।

১.৩ সরকারের উচিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা যাতে তাদের দায়িত্ব ভয়ভীতিহীনভাবে চালিয়ে যেতে পারে সেভাবে তাদের ক্ষমতা প্রদান করা। এজন্য তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তাও দিতে হবে যেমন : তথ্য সংরক্ষণ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ, ফটোকপি মেশিন এবং এ জাতীয় অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা। তাছাড়া সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরও সঠিকভাবে তথ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যার মধ্যে তথ্য সূচীকরণ, ক্যাটালগিং ও সংরক্ষণের বিষয়সমূহও থাকবে।

১.৪ সরকার একটি পুরষ্কার ব্যবস্থা চালু করতে পারেন যার মাধ্যমে যেসব সরকারী কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগে ও প্রসারে সবচেয়ে ভালো কাজ করেছেন তাদের আরো উদ্বুদ্ধ করা যায় এবং অন্যান্যদেরও এ ব্যাপারে আগ্রহী ক'রে তোলা যায়।

১.৫ যেসব অফিসে এখনও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম জনগণের জ্ঞাতার্থে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়নি সেখানে সরকারের উচিত অফিসের নোটিশ বোর্ডে অথবা সহজে চোখে পড়ে এমন জায়গায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তার নাম টাঙ্গিয়ে দেয়া যাতে জনগণ সহজেই তা দেখতে পারে। সেইসাথে এগুলো তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে দিয়ে দিতে হবে এবং ওয়েবসাইটগুলো নিয়মিত আপডেট ও ব্যবহারকারীদের জন্য সহজবোধ্য করতে হবে। তবে যেহেতু বেশীরভাগ জনগণের ইন্টারনেট সুবিধা নেই সেহেতু চিরাচরিত বোর্ডে লেখা নোটিশ ব্যবস্থাও চালু রাখতে হবে।

১.৬ পাবলিক অফিসসমূহে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী **স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ** ব্যবস্থা চালু করা খুব জরুরী। সাধারণ তথ্যাবলীর (যেমন : কারা কোন দায়িত্ব পালন করছেন তাঁদের নাম ও ফোন নম্বর) পাশাপাশি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী, বিশেষ করে তথ্য অধিকার আইন পাশ হওয়ার পর থেকে জনগণ

যেসব তথ্য সবচেয়ে বেশি জানতে চায় সেগুলোও অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এর ফলে অপ্রয়োজনীয় আবেদনপত্রের সংখ্যা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উপর কাজের চাপ কমবে।

১.৭ তৃণমূল পর্যায়ে **স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের তালিকা** ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, পাবলিক কর্তৃপক্ষসমূহ সাধারণতঃ সেই সকল তথ্য উন্মুক্ত করতে প্রস্তুত থাকে যা প্রকাশ হলে তাদের কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না । আর তারা যেসব তথ্য গোপন রাখতে চায় সেগুলো আবেদন করা ছাড়া সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। তাই স্বপ্রণোদিত তথ্য তালিকায় এ ধরণের তথ্যও প্রকাশ করতে হবে।

১.৮ এক কথায়, জনগণের সঠিক তথ্য নিশ্চিত করতে সরকারকে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিতে হবে। তাছাড়া যেসব নাগরিক পাবলিক কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চাইবে তাদের সুরক্ষার জন্যে আইনী ব্যবস্থাও নেয়া প্রয়োজন। তথ্য আবেদনকারী ও তথ্য কর্মীদের সুরক্ষার জন্য হুইসেল-ব্লোয়ার এ্যাক্ট ২০১০-এ তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১.৯ তথ্য অধিকার আইনটির সাফল্যের জন্যে একটি সক্রিয় এবং কার্যকর তথ্য কমিশন খুবই জরুরী। তাই তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় লোকবল, আর্থিক এবং অন্যান্য চাহিদাসহ সকল ধরণের সাহায্য সহযোগিতা দেয়া সরকারের একান্ত কর্তব্য। তথ্য কমিশনের স্বায়ত্বশাসন এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাও সরকারের দায়িত্ব।

২) তথ্য কমিশনের জন্য :

২.১ প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্য দুইজন তথ্য কমিশনারের উচিত তাঁরা যেন তাঁদের যাবতীয় বক্তৃতায় ও প্রতিবেদনে জনসাধারণকে একটি কথা সহজভাবে বুঝিয়ে দেন যে, তথ্য অধিকার আইন শুধু একজন নাগরিকের তথ্যের জন্য আবেদন ও সেই তথ্য প্রাপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার জন্য তৈরী হয়নি। এটি সরকারী কাজে স্বচ্ছতা স্থাপনের এবং অল্প পরিশ্রমে সরকারের কাছ থেকে কাঙ্খিত তথ্য পাওয়ার হাতিয়ার। তথ্য অধিকার আইনের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে, সরকারী কাজে স্বচ্ছতা স্থাপন ক'রে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ও তথ্যের জন্য আবেদন করার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে আনা।

২.২ তথ্য কমিশনকে তার সকল কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যে প্রতিষ্ঠানটি যেন একটি স্বায়ত্বশাসিত এবং নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি পায়, সরকারের অঙ্গ হিসেবে নয়। যেসব সরকারী কর্তৃপক্ষের

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা শুনানীতে অংশ নেন তাঁরা যেন মনে করেন যে, তাঁরা একটি আদালতে হাজির হয়েছেন, কোন সরকারী অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে নয়। শুনানীতে যাতে আদালতের পরিবেশ বজায় থাকে তা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে এবং তা যেন এই গুরুতর কাজের লক্ষ্য ও মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

২.৩ তথ্য কমিশনকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তথ্য আবেদনকারীর অভিযোগের সমাধান দিতে হবে। এ ব্যাপারে তথ্য কমিশনকে স্বচ্ছতার ধারক ও বাহক হতে হবে। তাদের মনে রাখতে হবে যে, তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্যই হচ্ছে তথ্যের সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। সুতরাং তথ্য কমিশন অন্যান্য নিরপেক্ষ আদালতের মত নয়। তথ্য কমিশনকে অবশ্যই তথ্য প্রদানের পক্ষে অবস্থান নিতে হবে। কারণ, আইনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে সরকারী কার্যক্রমের প্রক্রিয়াকে জনগণের কাছে উন্মুক্ত করা। অবশ্য কিছু কিছু তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয় ও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে কেন আইনটির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে তাও সকলকে যুক্তি সহকারে বোঝাতে হবে।

২.৪ তথ্য কমিশনকে মনে রাখতে হবে যে, আইনটি করা হয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর জনগণের ক্ষমতা স্থাপনের জন্য। তাই কিছু কিছু অভিযোগকারীদের কাছ থেকে তথ্য কমিশনের কঠোর আচরণের যে অভিযোগ পাওয়া গেছে তা অনভিপ্রেত। এ ধরনের অভিযোগ আসতে থাকলে, এতে তথ্য কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা কমবে এবং জনগণের সাথে তার দুরত্ব সৃষ্টি হবে।

২.৫ এ পর্যন্ত দেখা গেছে যে, কমিশন যেসকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা আইন অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করছেন না তাদের জরিমানা করা থেকে বিরত থেকেছেন। কমিশনের উচিত হবে আইন অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জরিমানা করা। পাবলিক কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা যেভাবে ক্রমাগত আইনটিকে অবজ্ঞা করে যাচ্ছেন তা বন্ধ করে আইনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে কমিশনকে অবশ্যই জরিমানা করার মত কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে, যা সবার জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।

২.৬ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আইনের ২৭(৩) ধারা অনুযায়ী আইন অমান্যকারীদের বিরূদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও সুপারিশ করতে হবে। মাঠপর্যায়ে শোনা যায় যে, অনেক সরকারী কর্মকর্তা জনগণের সামনে দম্ভ করে বলে বেড়ান যে তাদের বিরুদ্ধে আইন অমান্যের কারণে কেউ কিছু করতে পারবে না। একমাত্র জরিমানা এবং আইনানুগ অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই ধরনের কর্মকর্তাদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনা সম্ভব।

২.৭ কমিশনের উচিত শুনানীর সিদ্ধান্তসমূহ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে উভয় পক্ষকে জানিয়ে দেয়া। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে ১৮ টি শুনানীর সিদ্ধান্ত ছাপা হয়েছে। আইনের ২৫(১৩) নং ধারা অনুযায়ী সকল পক্ষকে অবশ্যই সিদ্ধান্তের লিখিত কপি প্রদান করতে হবে। আইনের ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী প্রণিত বিধিমালাতেও এটিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রচলিত আইনী ব্যবস্থায় সকলপক্ষ আদালত কর্তৃক ঘোষিত সিদ্ধান্ত জনসম্মুখে শোনার এবং সিদ্ধান্তের কপি বিনামূল্যে পাবার অধিকারী। কতদিনের মধ্যে সিদ্ধান্তের লিখিত কপি পাওয়া যাবে তা বিধিমালায় সংযুক্ত করতে হবে। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, কমিশন যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লিখিত সিদ্ধান্ত প্রদানে ব্যর্থ হয় তবে কমিশনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করা যায়। যেকোন বিচারিক প্রক্রিয়ায় এটি একটি রক্ষাকবচ।

২.৮ তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগের সংখ্যা যখন বেড়ে যাবে তখন কমিশনের উচিত হবে প্রত্যেক মাসে কতগুলো অভিযোগ পাওয়া গেছে, বিগত মাসসমূহে কতগুলোর শুনানি হয়েছে এবং কতগুলো এখনও শুনানি হয়নি তার তালিকা প্রকাশ করা। সেখানে যেসব কেস আগামীতে শুনানি হবে সেগুলোর দিন তারিখসহ উল্লেখ থাকতে হবে। ন্যুনতম এই কাজগুলো করলে বিচার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জনগণের আস্থা স্থাপন হবে। এ জাতীয় ভবিষ্যবাচ্যতা (predictability) ব্যতীত শুধু তথ্য কমিশনই নয় যেকোন বিচারিক প্রক্রিয়াই জনগণের গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

২.৯ তথ্য কমিশনকে আইন প্রয়োগে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে যাতে অন্যরাও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে তথ্য কমিশন আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শুনানি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২.১০ কমিশনের কর্মকান্ড, সিদ্ধান্তসমূহ ও এ জাতীয় যাবতীয় খবর গোটা জাতিকে নিয়মিতভাবে জানানো দরকার। কোন সরকারী কর্মকান্ড বা সরকারী চুক্তিতে অস্বচ্ছতার সম্ভাবনা দেখলে তা সবাইকে অবহিত করা খুব জরুরী। তাছাড়া তথ্য কমিশনের উচিত হবে বার্ষিক প্রতিবেদনের অপেক্ষায় না থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কমিশনের কাজের প্রতিবেদন প্রকাশ করা। এর ফলে জনগণের মনে ধারণা হবে কমিশন আইনটিকে সফলভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সম্ভব সবকিছুই করছে, যা কমিশনের কাজের সাফল্যের জন্যে অত্যন্ত জরুরী।

২.১১ কমিশনের আর একটি বড় কাজ হবে পাবলিক কর্তৃপক্ষসমূহ যখনই কোন বড় ধরণের চুক্তি করতে যায় (যেমন পি-পি-পি চুক্তি) তখনই সেই চুক্তি

আর-টি-আই-সম্মত কিনা তা খতিয়ে দেখা কিংবা কীভাবে তা করা সম্ভব সে ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া।

২.১২ এ পর্যন্ত যত শুনানী হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, অভিযোগকারীদের বেশিরভাগই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সদস্য। তাই কমিশনের উচিত হবে যে, এ ধরণের অভিযোগকারী যারা দূর-দুরান্ত থেকে বহু অর্থব্যয় করে ঢাকায় শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে আসেন, তাদের যাতে একাধিকবার আসতে না হয় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা। এটা মনে রাখতে হবে যে সরকারী কর্মকর্তারা তাদের এ ধরণের খরচ অফিস থেকে পেয়ে থাকেন কিন্তু সাধারণ জনগণ তা পাননা। তথ্য কমিশনের শুনানি দেশের বিভিন্ন স্থানে করার সম্ভাব্যতা এবং ভিডিও ও অডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে শুনানির সম্ভাব্যতাও যাচাই ক'রে দেখা যেতে পারে।

২.১৩ তথ্যের জন্য এককভাবে আবেদনের যে বিধি আছে, তার সঙ্গে অনেকে মিলে দলবদ্ধভাবে আবেদন করার ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিতে পারে তথ্য কমিশন। তাহলে জনগণের মন থেকে একা আবেদন করে পাবলিক কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়ার ভীতি দূর হবে। তবে এই সুযোগের ইতিবাচক-নেতিবাচক দিক সমূহ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা করে দেখা প্রয়োজন।

২.১৪ প্রধান তথ্য কমিশনার তাঁর বেশিরভাগ পাবলিক মিটিংয়ে একটি অভিযোগ বারবার করে থাকেন যে, এনজিওরা এখন পর্যন্ত তাঁর অফিসে তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তার নাম জমা দেয়নি বা প্রকাশ করেনি। তিনি তাঁর দিক থেকে ঠিকই বলেছেন। তবে তাঁর উচিত হবে একই কথা সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহকেও বারবার বলা। তথ্য কমিশনকে মনে রাখতে হবে, তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ ব্যবস্থাটি সারাবিশ্বে শুধু সরকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তার কারণ, তথ্য অধিকারের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে সরকারী সব কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। তাই পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই এনজিওদের আইনের আওতাভুক্ত করা হয়নি। বাংলাদেশে এনজিওদের এর আওতায় আনার জন্য অবশ্যই সরকার ধন্যবাদ পেতে পারে। তবে, কোনভাবেই এনজিওদের দায়দায়িত্ব সরকারের দায়দায়িত্বের সমকক্ষ হতে পারে না। সরকারের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হলে এনজিওদের স্বচ্ছতাও প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩. সুশীল সমাজ, এনজিও এবং মিডিয়ার জন্য সুপারিশ :

৩.১ যেসব এনজিও আইনের আওতায় পড়ে আর যারা আইন অনুযায়ী তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়নি বা তথ্য কমিশনকে জানায়নি, তারা যেন একাজটি অতিসত্ত্বর সম্পাদন করে তা নিশ্চিত করতে হবে। তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অবশ্যই আইনের মূল বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৩.২ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, এনজওিসমূহ এবং ব্যক্তিপর্যায়ের তথ্যকর্মীবৃন্দেরও উচিত হবে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাসের ব্যাপারে যথাসম্ভব প্রচারণা করা। তারা এ ব্যাপারে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা জেনে এ বিষয়ে কৌশল রপ্ত করতে পারে। এ ব্যাপারে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় একটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

৩.৩ এনজিও, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, তথ্য অধিকার কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত হবে তাঁরা যেন অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধভাবে একটি ওয়াচ ডগ বা তথ্য অধিকার রক্ষার অতন্দ্র প্রহরীদল গড়ে তোলেন। তাঁদের কাজ হবে তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগ নিশ্চিত করতে প্রয়োজন মতো চাপ সৃষ্টি করা। এজন্যে তাদের বিশেষ ক'রে প্রত্যেকটি শুনানীতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৩.৪ যেসব এনজিও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে থাকে তাদের উচিত নিজেদের কার্যক্রম নিয়ে একে অপরের সাথে আলাপ-আলোচনা করা ও সমন্বয় রক্ষা করা। কিছু কিছু এনজিও তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে এটা প্রমাণ করতে পেরেছে যে, এই আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের দারিদ্র্য কিছুটা হলেও প্রশমন করতে পেরেছে। এ বিষয়ে সকলের মধ্যে তথ্য ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান খুব জরুরী।

৩.৫ এনজিওদের উচিত হবে তাদের নিজেদের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রশ্নাতীতভাবে স্থাপন করা। আমাদের দেশে অনেক এনজিওই এখন বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তারা তথ্য ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য বিষয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে মডেল হতে পারে। তারা স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ব্যাপারেও একটি মডেল তৈরী করতে পারে।

৩.৬ তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহকেও সম্পৃক্ত করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। দলগুলোর অফিস

পরিচালনাকারী এবং কর্মীদেরও তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি খুবই জরুরী। রাজনৈতিক দলসমূহ তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারের উপর নজরদারী স্থাপন করতে পারে। তারা আইনটির ক্ষমতার/ সম্ভাবনার কথা সম্যকভাবে জানলে ও বুঝলে আইনটির ব্যবহারের ব্যাপারে উৎসাহিত হবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

৩.৭ বিভিন্ন মিডিয়ার উচিত তাদের সাংবাদিকদের জন্যে তথ্য অধিকার আইন সম্বন্ধে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া তথ্য কমিশনের কার্যক্রম ও শুনানির সিদ্ধান্তসমূহ জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়াও তাদের একটি মূল দায়িত্ব হওয়া উচিত। তথ্য অধিকার আইন যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, যার মাধ্যমে জনগণ ও সমাজের উল্লেখযোগ্য উপকার হতে পারে সেটা জনগণকে বোঝানো তাদের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। তথ্য কমিশনের কাজের ওপরেও তাদের নজর রাখতে হবে। প্রয়োজনে ধারাবাহিকভাবে পরামর্শ বা সমালোচনামূলক প্রবন্ধ/লেখা প্রকাশ করতে হবে। এ ধরণের প্রচারণার ফলে অন্যান্য অনেক লাভের মধ্যে জনগণের মন থেকে কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়ার ভীতিও দূর করা সম্ভব হবে।

৩.৮ আইনজীবি ও আইনবিদদেরও তথ্য অধিকার আইনটি ভালোভাবে জানতে হবে ও এটির ব্যবহারে উৎসাহী হতে হবে। এর মধ্যে যে অপার সম্ভবনা নিহিত আছে তা উপলব্ধি করতে হবে। যেমন তাঁরা কোনো কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাদের মক্কেলের স্বার্থ-সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাইতে পারেন যার জন্যে তাঁদের আদালতের ওপর নির্ভর করতে হবে না এবং যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এ ব্যাপারে আরো জানা যেতে পারে।

৩.৯ পরিশেষে বলা যায়, তথ্য অধিকার আইনের মৌলিক উদ্দেশ্য তখনই অর্জিত হবে যখন জনগণ আইনটির ব্যবহার ব্যক্তিগত লাভের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সামাজিক/রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে বৃহত্তর স্বার্থের ব্যবহারে নিয়ে যাবে। তাই তথ্য অধিকার আন্দোলনকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। এ ধরণের আন্দোলন শুরু করার জন্যে অনেক বিষয় রয়েছে যেমন, খাস জমির বন্টণ, বড় আকারের জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বিষয়ক চুক্তি, ইত্যাদি। শুধুমাত্র তখনই অপার সম্ভাবনাময় যুগান্তকারী এই আইনটি বাংলাদেশে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে বলা যায়।